সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর ৬১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যায়ভাবে বারবার গ্রেফতার মাওলানা নিজামী : ২০০৭ সালের অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্যায়ভাবে মাওলানা নিজামীকে গ্যাটকো মামলায় ২০০৮ সালের ১৮ মে দিবাগত রাতে গ্রেফতার করে। আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি ওই বছর ১৫ জুলাই মুক্তি লাভ করেন। এর কয়েক মাস পর ১০ নভেম্বর বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি মামলায় বিশেষ জজ আদালতে হাজির হতে গেলে জামিন না দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হাইকোর্ট তাকে ১২ নভেম্বর জামিন দিলে তিনি ১৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে মিথ্যা মামলায় আটক শহীদ মাওলানা নিজামী

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। ২০১০ সালের ২৯ জুন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বানোয়াট-ঠুনকো অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ৯টি হয়রানিমূলক মামলায় জড়ানো হয় মাওলানা নিজামীকে। এসব মামলায় তাকে ২৪ দিন রিমান্ডে নেয়া হয়। একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান ও শীর্ষ স্থানীয় আলেমকে রিমান্ডে নিয়ে মানসিক নির্যাতনের ঘটনা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে করেছে কলঙ্কিত।

অন্যান্য মামলায় জামিন পাওয়ার পরও সরকার হীন উদ্দেশ্যে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০১০ সালের ২ আগস্ট তাঁকে গ্রেফতার দেখায়।

কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার : রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সরকার জামায়াত নেতৃত্বকে সাজা দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করে। ১৯৭৩ সালের আইনে সংশোধন এনে দলীয় তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগ ও সাজানো সাক্ষী দিয়ে কথিত মানবতাবিরোধী বিচারের রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই বিচারের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিমালা নিয়ে শুরু থেকেই দেশে-বিদেশে বিশেষজ্ঞগণ গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ, আইনজীবীদের বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন,

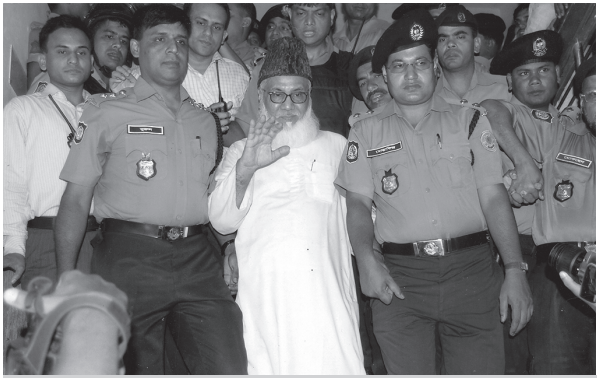

কথিত মানবতা বিরোধী অপরাধ ট্রাইবুনালে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইট্স ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্থা এ নিয়ে আইন সংশোধনের জন্য নানা সুপারিশও দিয়েছে। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাতই করেনি। সরকার তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকে একের পর এক হত্যা করেই চলছে। ইতোমধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীকার করেছেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেই বিচার হচ্ছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যার জন্যই আইন : যুদ্ধাপরাধের জন্য প্রণীত আইনটি নিজেই ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এটি মূলত এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রপক্ষ সবক্ষেত্রেই আইনি পন্থায় বেআইনি সুবিধা লাভ করতে পারে। ট্রাইব্যুনাল গঠন থেকে শুরু করে তদন্ত, বিচারক নিয়োগসহ সাক্ষ্যগ্রহণ এমনকি ফাঁসি কার্যকর করা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এ বিশেষ সুবিধার প্রতিফলন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর ৬ নং ধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে। যেখানে সরকার নিজেই বাদি সেখানে ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারক নিয়োগের এখতিয়ার সরকারের হাতে থাকায় নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন বা ন্যায়বিচার কোনটি-ই সম্ভব না। পাশাপাশি ট্রাইব্যুনাল চাইলে দ্রুত বিচারের স্বার্থে কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারবে আবার চাইলে রায় দেয়ার জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই পর্যাপ্ত মনে করতে পারবে।

শুধু তাই নয়, দেশীয় আদালতে বিচার হলেও সাক্ষ্য আইন ও ফৌজদারি কার্যবিধির মত মৌলিক আইনগুলোকে বাতিল করে পত্রিকায় ছাপানো খবর বা প্রবন্ধ, সাময়িকী, সিনেমা, টেপ রেকর্ডারসহ সব ধরনের অনির্ভরযোগ্য প্রমাণপত্র গ্রহণের এখতিয়ার আদালতের রয়েছে, যা ন্যায়বিচারের পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। যখন একজন বিচারকের স্কাইপ কেলেঙ্কারি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ পায় তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি মূলত বিচারের নামে প্রহসনের নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়।

২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, শুধু আসামিপক্ষ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। আইনটি এরকম ছিল কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে, আদালত অভিযুক্তদের ফাঁসি দেবে। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট বিচারক নিয়োগ দেয়ার পরও যখন শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে শুধু যাবৎ জীবন কারাদন্ড দেয়া হয় তখন বিচারিক হত্যা নিশ্চিত করার জন্য ধারাটি সংশোধন করে রাষ্ট্রপক্ষকেও আপিল করার অধিকার দিয়ে সংশোধনীর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করা হয়,

যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। তখন বুঝার আর বাকি থাকে না যে, এটি আসলেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনের মাধ্যমে একটি বিচারিক হত্যার আয়োজন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এর সর্বশেষ শিকার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এ দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ সকল ইসলামী নেতৃবৃন্দ তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

আমীরে জামায়াত মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি

- আল বদর কমান্ডার হিসেবে বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় চাপানো হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের যত পত্রিকা এবং গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট আছে, তার কোথাও আল বদর বাহিনীর সাথে মাওলানা নিজামীর দূরতম কোনো সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণ নেই। এসব পত্রিকা ও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট সরকার পক্ষই আদালতে দাখিল করেছিল।

- সাক্ষী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ও সালমা হক বলেছেন, ১৯৭১ সালের পত্রিকায় দেখেছেন মাওলানা নিজামী আল বদর বাহিনীর প্রধান, কিন্তু সরকারপক্ষের দাখিল করা ১৯৭১ সালের কোনো পত্রিকায়ই এ ধরনের খবর নেই। এ ব্যাপারে আদালতের যুক্তি, পত্রিকায় না থাকলেও তারা ২ জন যেহেতু সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, ধরে নিতে হবে তারা পত্রিকায় দেখেছেন।

- বলা হয়েছে ছাত্রসংঘ মানেই আল বদর। যেহেতু মাওলানা নিজামী ছাত্রসংঘের প্রধান ছিলেন, সেহেতু তিনি পদাধিকার বলে আল বদর বাহিনীরও প্রধান। মাওলানা নিজামী ছাত্রসংঘের প্রধান ছিলেন ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এর পর থেকে তিনি ছাত্রসংঘে ছিলেন না। বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা সেপ্টেম্বরের পরে হয়েছে। সেই হত্যাকান্ডের দায় দায়িত্ব তার ওপর চাপানো হয় কিভাবে?

- এ ব্যাপারে আদালত বলেছেন, মাওলানা নিজামী ৫ বছর ছাত্রসংঘের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাই তিনি ছাত্রসংঘ থেকে অবসর নিলেও একদিনে তাঁর এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। এর চেয়ে খোঁড়া অজুহাত আর কী হতে পারে?

- বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড নিয়ে দুইজন মহিলা সাক্ষী বলেছেন, তাদের স্বামীকে যারা ধরে নিয়ে যায়, তারা বলেছে, হাইকমান্ড নিজামীর নির্দেশে তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ দু'টি ঘটনা নিয়ে মামলা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড নিয়ে এ রকম আরো ৪০টিরও বেশি মামলা হয়েছিল। এসব মামলার কোথাও মাওলানা নিজামীর নাম তখন আসেনি। ওই দুই মহিলা সাক্ষী তাদের স্বামীদের হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে অসংখ্যবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। একজন সাক্ষী তার স্বামীর হত্যাকান্ড নিয়ে বই লিখেছেন। আরেকজন শাহরিয়ার কবিরের মতো চরম জামায়াতবিদ্বেষী মানুষের বইয়ে তার স্বামীর হত্যাকান্ড নিয়ে বিশদ বর্ণনা দেন। এ সবের কোথাও তারা এ ঘটনার সাথে মাওলানা নিজামীর দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিল, তা বলেনি। এমনকি এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছেও তারা মাওলানা নিজামীর নাম বলেনি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারা আদালতে এসে প্রথমবারের মতো মাওলানা নিজামীর নাম বলে।